স্বদেশ সংগঠন - তিন মহামানবের চোখে
(গান্ধীজী, নেতাজী, মানবেন্দ্র রায়)

সুপ্রিয় মুন্সী

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি দেশ ও সমাজ পুনগর্ঠনের একটি আন্দোলনও এখানে সংঘটিত হয়েছিল এবং নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ ভাবনা অনুযায়ী স্বাধীনোত্তর দেশের রূপরেখা নিজেদের মনে এঁকে রেখেছিলেন বা ব্যক্ত করেছিলেন। এই বিষয়ে যাঁরা বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন, বিশেষ করে এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। স্বাধীনোত্তর ভারত কি রকম হতে পারে তা তাঁদের কার্জক্রম, বক্তৃতা ও রচনা থেকে আমরা জানতে পারি ও বর্তমানে দেশের যে পরিস্থিতি তা তাঁদের ইপ্সিত দেশের কতো কাছাকাছি তা-ও এ থেকে জানা যেতে পারে।

এছাড়াও মৌলিক চিন্তবিদ হিসাবে নবমানবতাবাদের উদগাতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পরিকল্পনা ও স্বাধীন দেশ সম্বন্ধে চিন্তা আমরা বিবেচন করতে পারি। মানবেন্দ্র রায়ের বিভিন্ন লেখা, যার মধ্যে 'পিপলস্ প্ল্যান' ও নবমানবতাবাদ দর্শনের বিভিন্ন সূত্র রয়েছে, তাদের থেকে এই বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণা জানা যায়।

তবে এই নিশ্চিতই যে কেবলমাত্র গান্ধীজী তাঁর 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন ও 'গঠন মূলক কার্যক্রমের 'মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও সমাজ পুনর্গঠনের কাজ সমান্তরালভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন - যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কোন ফাঁক না থাকে ও 'সর্বোদয়' স্থাপনের অন্তরায়গুলি অনায়াসে দুর করা যায়। এ বিষয়ে আরো একটি দিক আমরা লক্ষ্য করতে পারি যেটি হলো গান্ধীজীই একমাত্র ব্যক্তি ও নেতা যিনি সারা দেশ ঘুরে দেশ ও দেশের মানুষের চরিত্র ও প্রয়োজনকে সম্যকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, যেটি অন্য দুইজন করেননি। এই জন্যেই গান্ধীজী সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছিলেন এবং আজো মনে হয় যে দেশের বর্তমান অবক্ষয়ী পরিস্থিতির উদ্ভবই হতো না যদি তিনি বেঁচে থাকতেন।

অবশ্য নেতাজী গ্রামে-গঞ্জে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের কাজে ঘুরেছিন এবং মানবেন্দ্র তাঁর ছোটবেলায় দেখা দেশটিকে ভোলেননি বলেই পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনা করতে গিয়ে এর সঠিক প্রয়োজনের উপরেই জোর দিয়েছেন। এছাড়াও তাঁদের বৈদগ্ধ এবং সমাজ ও মনুষ্য-চরিত্রের গতি প্রকৃতি ও পরিস্থিতির সঠিক 'রিডিং' বা মূল্যায়ন স্বাধীনোত্তর দেশ গড়ার কাজে চিন্তা চিন্তা ও কার্যক্রম তৈরীতে যথেষ্ট সহায়াতা করেছে। আশ্চর্যজনকভাবে এঁরা তিনজনেই দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর জোর দিয়েছেন - ব্যাপক দুর্নীতি বিষয়ে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আমরা এখন তিন নেতৃবৃন্দের নিজেদের কথাতেই তাঁদের চিন্তা অনুযায়ি দেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আলোচনা প্রাক্কালে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে এঁদের কেউই স্বাধীনোত্তর দেশ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেননি। মানবেন্দ্রনাথ অবশ্য বেশ কিছু বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু বিবিধ কারণে, বিশেষ করে পরে শারীরিক পরিস্থিতি কার্যক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্ট করেছে।

মহাত্মা গান্ধী : মহাত্ম গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ' পুস্তক 'আমার স্বপ্নের ভারত' রচনা ও পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে লেখা ১৩ই অক্টোবর ও ৫ই নভেম্বর ১৯৪৫ সালের দুটি চিঠির সংযোজনে একটি পুর্ণচিত্র ও রূপরেখা আমরা পাই। এছাড়াও ঈষোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি তাঁর প্রস্তাবিত সমাজের একটি রূপরেখা হতে পারে:

"ইশা বাস্যং এদম সর্ব্বম্, যৎকিন্চিফ জগত্যাম জগৎ।
তেন তক্তেন ভূঞ্জিথাঃ মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম্।।"

পূর্বোল্লখিত 'আমার স্বপ্নের ভারত'-এ তিনি লিখেছেন, "ভারত মুখ্যতঃ কর্মভূমি, ভোগভূমি নয়।..... পৃথিবীতে ধর্মের (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক, মানবিক মূল্য বোধের) শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করার কাজে ভারতই উপযুক্ত।..... এমন এক ভারত সরষ্ট হবে যেখানে কোন রকম দাসত্ব থাকবে না; দরিদ্রতম ব্যক্তিও অনুভব করবে যে এ তারি দেশ এবং এর উন্নতির জন্যে তার মতামতও যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। উচ্চ-নীচ, দনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ থাকবে না, সকলেই সমান অধিকার পাবেন। সকল সম্পরদায় সৌহার্দ্র্যের মধ্যে বাস করবে, অস্পশ্যতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের স্থান থাকবে না, এবং বিশ্বের অপরাপর অংসের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ। সে কাউকে শোষণ করবে না বা নিজেও কারো দ্বারা শোষিত হবার সুযোগ দেবে না। সৈন্যবাহিনী যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হবে এবং ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণের পরিপন্থী না হলে অভারতীয় স্বার্থসমূহকে সততার সঙ্গে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে।

স্বাধীন সমাজের মূল ভিত্তি হবে গ্রাক্ষম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বশাসিত, স্বনির্ভর জনগোষ্ঠী, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়, সহযোগিতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী একে অপরের উপর নির্ভরশীল থেকে কেবল দেশের জন্য নয়, প্রয়োজনে সারা পৃথিবীর জন্যে এরা কাজ করবে ও চরম ত্যাগ স্বীকারও করবে। এখানকার অধীবাসীরা হবে সংস্কৃতিবান ও এই সমাজের মর্মবাণিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তারা কাজ করে যাবে এবং প্রয়োজনে অন্যের স্বার্থে আত্মবলিও দিতে তৈরী থাকবে।

রাজনৈতিকভাবে অসংখ্য গ্রাম, ক্ষিদ্র জনপদ দ্বারা নির্মিত এই কাঠামো নিয়ত পরিবর্ধনশীল গ্রামগোষ্ঠী নিয়ে রচিত হবে। জীবন এখানে পিরামিডের মতো হবে না, যার চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে তলদেশের শক্তিতে। এ হবে এক সামুদ্রিক বেষ্টনীর মতো, জার কেন্দ্র হবে প্রতিটি ব্যক্তি, নর-নারী নির্বিশেষে ন্যনতম যোগ্যতা বিশিতট যাবতীয় সাবালকের মতামত দ্বারা নির্বাচিত ৫ জনের একটি পঞ্চায়েত গ্রাম বা ক্ষুদ্র জনপদের শাসনকার্য চালাবে, যা এই দেশে অনেকদিন ধরেই প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ, পঞ্চায়েত থেকে অঞ্চল, জেলা, প্রাদেশিকসবা হয়ে কেন্দ্রে এক প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হবে।

যে যন্ত্র দ্বারা শ্রমশক্তি বেকার হয় এবং মুষ্টিমেয় জনাকয়েকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তার স্থান এই নবভারতে খাকবে না। অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাই মূলত অনুসারিত হবে এবং সহযোগী এক শিক্ষা ব্যবস্থা (নই তালিম), যা একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত আবশ্যক হবে, এটিকে সম্ভব করে তুলবে।"

আরো বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যানকামী দিকগুলিকে ব্যবহার করে জনগণবহুল উৎপাদন নয়, তাদের ন্যূনতন প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদন এখানে করেন, কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বৃহৎ শিল্প সংঘটিত হবে এবং ভোগ্য পণ্যের প্রতি চাহিদা উৎসাহিত হবে না। বিপুল ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও

তার জন্যে বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজী সচেতন ছিলেন এবং এর নিয়ন্ত্রনের কথাও তিনি বলেছিলেন। "সহজ জীবন, উচ্চ-চিন্তন", ঋষি বাণী অনেক ভারতীয় মণিষীর মতো গান্ধীজীকেও প্রভাবিত করেছিল।

স্বদেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন গান্ধীজী এমন একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন যেখানে অমানবিক কাজকর্মের সুযোগ থাকবে না (গান্ধীজী এগুলিকে 'মনস্তাত্বিক বিকার' বলেছেন), সতত পালিত একাদশ ব্রত এবং গঠনমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত দেশবাসী এই আবশ্রকে বাস্তবায়িত করতে পারবেন বা অন্ততঃ এর কাছাকাছি যেতে পারবেন এই বিশ্বাস ছিল তাঁর। অবশ্য এইরকম সমাজের রক্ষাকবচ হলো সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমশহ একই পরিকাঠামো ব্যবস্থা সৃষ্টি করা, অর্থাৎ গান্ধীজীর পৃথিবী হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র চিন্তাটিকে বাস্তবায়িত করা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু : নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সভাপতি হিসাবে যে বক্তৃতা প্রদান করেন সেই থেকে স্বাধীন বারত ও তার সরকার কিরূপ হবে বা বিভিন্ন কি নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে তার একটি রূপরেখা আমরা পেতে পারি। ভারত যে বিভক্ত হতে পারে তার একটি লজিক্যাল কনক্লুশন্ ব্রিটিশ নীতে থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং সেইজন্যে বক্তৃতার শুরুতেই সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন তাঁদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা ছাড়া ভারতীয় জনগণের ভালো করা যাবে না।

আমরা জানি যে গান্ধীজী চেয়েছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের পরে কংগ্রেসকে একটি দল হিসাবে না রেখে লোকসেবক সংঘে পরিণত করতে যাতে দলীয় যে ত্রুটিগুলি আমরা সাধারণত দেখে থাকি তা যাতে দেশ গড়ার কাজে ব্যাঘাত না করে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন যে, স্বাধীনতার পরে দেশের হাল কংগ্রেসই ধরবে এবং যেহেতু কংগ্রেসের ভিত্তিভূমি গণতান্ত্রক এটি কখনোই স্বৈরাচারী হবে না ও দেশের শাসন ব্যবস্থাও স্বৈরাচরী হবে না। তাছাড়া অন্যদল তো থাকবেই এবং নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারে আসবেন। তাঁদের উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এখানে প্রচলিত হবে।

এরপরে দেশের পুনর্গঠনের কাজে মূল সমস্যাগুলি কি ও কিভাবে তা দূর করা যাবে বলতে গিয়ে তিনি জাতীয় পরিকল্পনার কথা বললেন। একটি জাতীয় কমিশন গড়ার কথা বললেন জারা এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করবেন ও কার্যক্রম সংগঠিত করবেন এবং যা সবসমেই সমাজবাদী ধারাতেই করা হবে।

তিনি বললেন, এখানে সমস্যা হলো দারিদর্য যা দূর করতে হলে জমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে ও জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবে। কৃষি মূল উপজীব্য, তাই তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কৃষিঋণ মকুব করা হবে, গ্রামের জনগণ সহজেই ঋণ পাবেন এবং সমবায় প্রথার ভিত্তিতে উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীরা উভয়েই উপকৃত হবেন।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ও প্রসার ঘটবে, তবে জনসংখ্যার চাপ ও হার কমাতে না পারলে সব পরিকল্পনাই বিফল হবে বলে তিনি জানালেন।

বৈদেশিক নীতের বিষয় বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, অন্যদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক অবশ্যই গড়ে তোলা হবে বা থাকবে, কিন্তু তাদের দ্বারা বা তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি বা রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের কোনভাবেই প্রভাবিত করবে না।

স্বাধীন ভারতের একটি জাতীয় ভাসা ও লিপির উপরে তিনি জোর দেন, যা জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করবে।

মূলতঃ রাষ্ট্র-পরিচালনার বিষয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বা সমন্বয়কারী এক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন তিনি।

আজন্ম বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায় : মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদগ্ধ পন্ডিত ও কোন্ দর্শন বা মতবাদে ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও মুক্তি হতে পারে তারজন্যে তাঁর তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক গভীর অধ্যয়নের বিষয়। প্রায় শেষ পর্বে তিনি ছিলেন 'প্রকৃত' গণতন্ত্রের পূজারী ও প্রচারক এবং স্বভাবতই, রাজনৈতিক অথবা অর্তনৈতিক, উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের পূর্ণ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

'পিপল্স্ প্ল্যান' - এ তিনি লিখেছেন "এটি প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে ভারতের জনগণের দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র উপায় হলো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা। এইমতটি একান্তই ভাসাভাসা এবং তাতে মাত্র অর্ধসত্যই প্রাকাশিত হয়। আর সকল অর্ধসত্যের মতোই এটি হল বিপজ্জনক ভারতে বৃহৎ শিল্পায়নের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হলো অধিকাংশ লোকের অতি সামান্য ক্রয়-ক্ষমতা। জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা যদি বাড়াতে হয় কৃষির উপরেই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ দেশের অধিকাংশই কৃষিজীবী।"

তাছাড়াও শুধুমাত্র মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই যদি উফপাদন করা হয় তবেই ভারতে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব, নতুবা নয়। অন্যকথায়, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মে চললে অর্থাৎ বাজারে বিক্রি করে লাভ করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করতে চাইলে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়।

রায় তৃতীয় বিশ্বময় যুদ্ধের আশঙ্কা করেছিলেন কারণ দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবী তাঁর মতে দুভাগ হয়ে গয়য়েছিল - একদিকের নেতা আমেরিকা ও অপরটি রাশিয়া। সেইজন্যে যে কোন উপায়ে এই সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয় করলে জগতের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হবে, মানুষের অন্ন-কষ্টের দুঃখ ঘুচবে না। আর স্বাধীনোত্তর ভারতের এই বিষয়ে একটি বড় ভূমিকা থাকবে। তাই তার উচিত এমন কোন কাজ না করা যাতে এই বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন পক্ষভুক্ত না হওয়া এবং সামরিক শক্তিডুপে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা ন করা।

মানবতাবাদী দর্শনের ১৮ নম্বর সূত্রে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর ঈপ্সীত নতুন সমাজের ছবি আঁকলেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় - "নতুন সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি হবে প্রয়োজন মেটানোর জন্যে উৎপাদন, লাভের জন্যে নয়। এবং বন্টন হবে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে।

রাজনৈতিক সগগঠনে প্রতিনিধি মারফৎ শাসন-ব্যবস্থার কোন স্থানই থাকবে না কারণ এই ব্যবস্থায় সব ক্ষমতা চলে যায় প্রতিনিধিদের হাতে - জনসাধারণের হাতে কিছুই থাকে না। তারা চির নাবালকই থেকে যায়। সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দ্বারা নির্বাচিত ও প্রত্যক্ষবাবে পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মারফৎ শাসনকার্যে অগশগ্রহণই হবে এই নতুনসমাজের রাজনৈতিক ভিত্তি। এই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠবে সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ওপর। এই শিক্ষাদনের নীতি হবে বৈজ্ঞানিক ও সৃষ্টিমূলক কাজে যথাসম্ভব কম বাধানিসেধ আরোপিত হবে। যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে গঠিত এই সমাজে অপচয় নিবারণের জন্যে একটি পরিকল্পনা রচিত হবে যা অবশ্যই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রেখেই রচিত হবে। অর্থাৎ এই সমাজ সবদিক থেকেই

গণতান্ত্রিক হবে - রাজনীতিতে হবে আসল গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবার অধিকার হবে সমান, কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না। এবং যেহেতু এই গণতন্ত্রে সকল মানুষেরই জীবন উপভোগ্য ও সুখকর হয়ে উঠবে সেইহেতু বিপদকালে এই গণতন্ত্রকে নিগস্বজ্ঞানে সকলেই রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে, এরজন্যে প্রাণপণ করবে।"

এই সমাজ কি বাস্তব? গান্ধীজীর মতো মানবেন্দ্রনাথও বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন, তাড়াহুড়োয় নয়। জনগণকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে এই মুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে, তার কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব নেবেন অনাসক্ত, মুক্তবুদ্ধি মানুষ।

গান্ধীজীর মতোই তাঁরও পরিকল্পনা ছিল সারা বিশ্বের জন্যে - একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পৃথিবীর পক্ষে। (ইংরাজীতে লেখা ও ভাষণ থেকে সহজ অনুবাদ বর্তমান প্রবন্ধকারের দ্বারা)।